গুপ্ত বাবুর সুপ্ত বাসনা; এবং র্বতমান সরকারের ভবিষ্যত (শেষ পর্ব)!

বাংলাদেশে কোন মন্ত্রীর এইভাবে হাতেনাতে ধরা খাওয়ার এটি দ্বিতীয় উদাহরন। প্রথমটি ঘটেছিল ১৯৮১/৮২ সালে বিচারপতি সাত্তার সাহেব এর শাসনামলের সময়। ইমদু নামে কালিগঞ্জের এক কুখ্যাত খুনী , ততকালীন যুব প্রতিমন্ত্রী আবুল কাশেম'এর বাসা থেকে গ্রেফতার হয়। কুখ্যাত খুনী ইমদু, যুব প্রতিমন্ত্রী আবুল কাশেম'এর বাসায় নিয়মিত আসা-যাওয়া করতো, সেই ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। গ্রেফতারের দিন পুলিশের তৎকালীন যুব প্রতিমন্ত্রী আবুল কাশেম'এর বাসা'য় হটাৎ করে হানা দেওয়া এবং ইমদু 'কে গ্রেফতারের ঘটনায়, অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল যে, হটাৎ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এত ভাল হয়ে গেলেন কি ভাবে? এই ঘটনা কি দলীয় কোন্দলের ফল, না কি তৃতীয় কোন শক্তি এই ঘটনার পিছনে জড়িত?

এই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যেই, ২৪ র্মাচ ১৯৮২ সালে হোঃ মোঃ এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। হোঃ মোঃ এরশাদ এর ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপট হিসাবে 'মন্ত্রী'র বাসায় খুনী'র অবস্থান বা মন্ত্রীর সাথে খুনীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা উল্লেখ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বিচারপতি সাত্তার সরকারের সেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ক্ষমতা পরির্বতনের কিছুদিনের মধ্যেই হোঃ মোঃ এরশাদ এর মন্ত্রীসভায় স্থান করে নেন।

অনেক দশকঅভাবে সুযোগের অভাবে 'গুপ্ত বাবুর সুপ্ত বাসনা', সুপ্তই ছিল। মন্ত্রী হওয়ার পরে, অনুকুল পরিস্থীতি পেয়ে সেই সুপ্ত বাসনা খুউব দ্রুত বিকশিত হতে শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যেই সারাদেশে রেললাইনের মাধ্যমে সেই সুপ্ত বাসনা, র্বাড-ফ্লু ভাইরাসের চেয়েও দ্রুত ছড়িয়ে পরে। মন্ত্রী গুপ্ত বাবু প্রতিদিনই হয়তো, যাদুকরের মত বস্তায় দিনে কালো বিড়াল ঢুকিয়ে, রাতে (কালো) টাকা বের করতেন। কিন্তু গুপ্ত বাবুর কপালে এত সুখ সইল না, হিংসুটেরা তার ভালো দেখতে পারলো না (!), এক রাতে হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিল।

একই ভাবে, টাকার বস্তা সহ গুপ্ত বাবু'র এপিএস'এর ধরা পড়া এবং ড্রাইভার নিরূদ্দেশ হওয়া, নিখোঁজ (?) বা গুম হওয়ার ঘটনার পিছনে কি অন্য কারো যোগসাজেশ আছে, ভবিষ্যতই এই সব প্রশ্নের উত্তর দিবে। জানিনা 'গুপ্ত বাবুর সুপ্ত বাসনা' র্পূন করার জন্য আওয়ামী লিগের এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির, আর কত মূল্য দিতে হবে?

তবে দেশের মানুষ যেন গুপ্ত বাবুর এই কেলেংকারীর কথা সহজে না ভূলে যায়, বি এন পি যে স্বাভাবিক কারনেই তা বার বার মনে করিয়ে দিবে, তা বলাই বাহূল্য। উন্নত এবং সভ্য সমাজ ব্যাবস্থায়, আমরা দেখতে পাই, যখন কোন দলীয় মন্ত্রী বা নেতা এই ধরনের কেলেংকারীর সাথে জড়িয়ে পড়েন, তখন দল সাথে সাথে তার সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করেন এবং সেই মন্ত্রী বা নেতাকে দল থেকে বহিস্কার বা সাসপেন্ড করা হয়।

আমাদের দেশের মানুষের র্দূভাগ্য, কেলেংকারীর সাথে জড়িত সেই মন্ত্রী বা নেতাকে দল থেকে বহিস্কার বা সাসপেন্ড করা তো দূরে থাক, তার পক্ষে সাফাই গাওয়া হয়। তাকে দলীয় প্রোটেকশান দেওয়া হয়। এমনকি, লেখক এবং বুদ্ধিজীবীগন'ও সেই মন্ত্রী বা নেতাকে সর্মথন করে কলাম লিখেন! অদ্ভুত এক দেশ, আমাদের এই বাংলাদেশ, এই দেশে অনেক লেখক' (বা চামচা) একদিকে নোবেল বিজয়ী, বিশ্ব বরেন্য প্রফেসর ইউনুস'এর বিরূদ্ধে আর অন্যদিকে হাতে নাতে ঘুষের টাকা সহ ধরা পরার পরও, সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের পক্ষে, কলম ধরেন এবং এই ধরনের অন্যায় কাজে পরোক্ষভাবে সাহস যোগান!! আর হয়তো এই সব কারনেই, আমাদের দেশে দিন দিন, গুপ্ত বাবুর মত বাকস্বব্বস্ব, চাটুকার নেতাদের সংখ্য দিন দিন বেড়েই চলেছে!

তৎকালীন যুব প্রতিমন্ত্রী আবুল কাশেম' ছিল দলছুট এক ব্যাক্তি, যার কাছে জাতির তেমন কোন প্রত্যাশা ছিল না। অন্যদিকে সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, অভিজ্জ সাংসদ ও বাকপটু রাজনীতিবিদ হিসাবে সুপরিচিত। তার মত একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ, যিনি ধরা পরার পূব্ব পরযন্ত, সৎ এবং চরিত্রবান বলে পরিচিত ছিলেন, শেষ বয়সে তার এই করুন পরিনতি দেখে, প্রয়াত অভিনেতা ও নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুনের আশির দশকের খুউব জনপ্রিয় একটি উক্তির কথা মনে পড়ে যায়। আবদুল্লাহ আল মামুন **সম্ভবত সুরঞ্জিত সেন গুপ্তের মত মানুষদের** উদ্দেশ্যেই সেই উক্তিটি করাছিলেন। সেই উক্তিটি ছিল, **"চরিত্র; সে তো সুযোগের অভাব!"**

প্রসংগ, ইলিয়াস আলীঃ বি এন পি নেতা ইলিয়াস আলী'র গা ঢাকা দেওয়া, নিরূদ্দেশ হওয়া, নিখোঁজ (?) বা গুম হওয়া; নিয়ে চুড়ান্ত মন্তব্য করার সময় এখনো আসে নাই। তবে, সাগর-রুনি হত্যাকান্ড এবং বি ডি আর এর ঘটনা সর্ম্পকে মানুষের মধ্যে এখনো অনেক প্রশ্ন জমা রয়েছে কারন র্বতমান সরকার এই সব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পুরাপুরি র্ব্যাথ হয়েছেন। তাই বি এন পি নেতা ইলিয়াস আলী'র ঘটনায় সরকার জড়িত কিনা, এই নিয়ে সঙ্গত কারনেই অনেকের মধ্যেই সন্দেহ দানা বেধেছে। র্বতমান পরিস্থিতি'তে মনে হচ্ছে, সরকার, 'ফুটন্ত কড়াই থেকে, জ্বলন্ত উনুনে ঝাপ দিয়েছে"।

ইলিয়াস আলী'কে কি সত্যিই র্বতমান সরকার গুম করেছে? করে থাকলে র্বতমান সরকারের কি লাভ বা ক্ষতি, তা নিয়ে একটু চিন্তা করার অবকাশ আছে। ছাত্র দলের প্রক্তন ক্যাডার ইলিয়াস আলী, বি এন পি'র প্রবীন নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা, মরহুম জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, প্রাক্তন র্অথমন্ত্রী মরহুম সাইফুর রহমানের সাথে বেয়াদবি করার জন্যই অনেকবার খবরের বিষয় হয়েছিলেন। আমি মনে করি, ইলিয়াস আলী' এমন কোন বড় মাপের নেতা নন বা তার এমন কোন 'পজিটিভ ইমেজ' বা প্রভাব নাই, যে জন্য তাকে গুম করা প্রয়োজন ছিল বা আছে।

ইলিয়াস আলী'কে যদি সত্যিই র্বতমান সরকার গুম করে থাকে তা হবে আওয়ামী লিগের জন্য শতাব্দীর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ভূল সিদ্ধান্ত। এই ধরনের ভূল সিদ্ধান্তের একমাত্র কাল্পনিক তূলনা হতে পারে, বি এন পি'র সময়ে বি এন পি র্কতৃক আওয়ামী লিগ নেতা 'জয়নাল হাজারী'কে গুম করার সাথে। বি, এন পি'র শাসনামলে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে, আওয়ামী লিগের জন্য শাপে-বর হতো। এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্তে সরকারের চেয়ে বিরোধী দলের লাভই বেশী। তবে ইলিয়াস আলী'কে যদি সত্যি সত্যি গুম করা হয়ে থাকে, তা আমাদের দেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় এক ভয়াবহ মতুন মাত্রা যোগ করবে।

সোহেল তাজ এর পদত্যাগঃ একই সময়ে সৎ ও নীতিবান রাজনীতিবিদ বলে পরিচিত, সোহেল তাজ এর সংসদ সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘটনায় অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন জেগেছে আওয়ামী লিগ বিশেষত র্বতমান সরকার, কে বা কারা চালাচ্ছে! গত একমাস ধরে যখন দেশের রাজনীতি'তে প্রচন্ড সংকট চলছে, সেই সময় সংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করে সোহেল তাজ কি, নিজেকে এই কালিমা ও পংকিলতা থেকে দূরে রাখতে চাইছেন? আমরা সবাই জানি প্রতিমন্ত্রী'র পদ থেকে পদত্যাগ করার পর সোহেল তাজ' শারিরিক ভাবে দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে আমেরিকায় আছেন, কিন্তু র্বতমান সরকারের ভিতরের অবস্থা কি এতই খারাপ যে, সোহেল তাজ, সংসদ সদস্য হিসাবেও নিজেকে আর এই র্বতমান সরকারের নিস্ক্রিয় অংশ হিসাবেও রাখতে চাইছেন না!

সরকারের ভিতরের অবস্থা কি সত্যি এতই খারাপ? মনে হয়, তা না হলে, র্বতমান সরকারের সবচেয়ে সফল ও সৎ মন্ত্রী বলে পরিচিত, মতিয়া চৌধুরী, নুরুল ইসলাম নাহিদ; র্দীঘদিনের ত্যাগী নেতা তোফায়েল আহমেদ, আমু, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন; সবাই কেন এত নিশ্চুপ এবং কেন নিজেদের দুরে সরিয়ে রেখেছেন? অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, চাটুকার ও সুযোগ সন্ধানী নেতা এবং মন্ত্রীরা, প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার চারিদিকে র্দূভেদ্য বলয় তৈরী করে রেখেছে, যেমনটি, করে রেখেছিল ১৯৭৫ সালে।

১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর সোহেল তাজ'এর পিতা, জনার তাজউদ্দীন আহমেদ র্অথমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের ঢাকায় আসার কয়েক দিন আগে। জনাব তাজউদ্দীন আহমদের বিদায় সেদিন গোটা জাতিকে ব্যথিত করেছিল। ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর, যেই দিন শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ র্অথমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই দিন সচিবালয়ের সামনে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ এবং অথবা সম্মতিতে, সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। কুচক্রীরা (মূলত, ট্রিপল এম; মোশ্তাক, মনি, মোয়াজ্জেম) সেদিন বঙ্গবন্ধুকে বুঝিয়ে ছিল যে, র্অথমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, বঙ্গবন্ধুর জন্য হুমকিস্বরূপ! ১৯৭৫ সালে কুচক্রীদের চালে, বঙ্গবন্ধুর সাথে অন্য তিন জাতীয় নেতার'ও দুরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন, আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা স্বার্থান্বেষী মহলটি মুজিব ও তাজউদ্দীনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দেশের সব্বনাশ করেছে। এ ঘটনার কয়েক মাসের মাথায় কুচক্রীরা প্রথমে বঙ্গবন্ধুকে, পরে তাজউদ্দীন আহমদকে হত্যা করে। সেই বিভাজন জাতির যে ক্ষতি করেছে, তা আজও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৪/৭৫ সালে চাটুকার পরিবেষ্ঠিত বংগবন্ধু, যেমন শত্রু/মিত্র চিনতে মারাত্মক ভূল করেছিলেন, এখনও তার পুনরাবৃত্তি চলছে। সেই সময়ের মত আজও নেতৃত্ব বন্ধুহীন।

বাপের বেটা সোহেল তাজ এবং কাদের সিদ্দিকীঃ সম্প্রতি (২৭ এপ্রিল) কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, সোহেল তাজ এর প্রসংশা করে বলেছেন, '**বাপের বেটা সোহেল তাজ**'। ভাগ্যের কি র্নিমম পরিহাস, জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ সাহেব যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এই কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, ছিলেন তার অন্যতম কঠোর সমালোচক! কারন, নীতির প্রশ্নে আপোষহীন, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ এর নির্দেশেই, স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার র্কতৃক প্রথম গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়েছিল এই কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, এর বিরূদ্ধে।

১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে প্রকাশ্যে চারজন মানুষ'কে বেয়নেট চার্জ করে হত্যার জন্য কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, এর বিরূদ্ধে সেই গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়েছিল। সেই হত্যাকান্ড, সারা বিশ্বের টি ভি'তে সেই সময় দেখানো হয়েছিল, যা এখনও ইউ টিউবে' দেখতে পাওয়া যায়। কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, এর ভাষায় (স্বাধীনতা ৭১; কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম), সেই চারজন ছিল, বিহারী নারী'দের উপর র্নিজাতনকারী, অন্যদিকে বিদেশী টি ভি'র ভাষ্য অনূযায়ী সেই চারজন ছিল বিহারী? তারা যাই হউক না

কেন, আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার জন্য কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, অবশ্যই অপরাধী ছিলেন।

আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কঠোর নীতিবান, সেই দূর্দিনের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা বলে কাদের সিদ্দিকী'র প্রতি কোন সহানুভূতি দেখান নাই। চার দশক পরে কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, আজ হয়তো তার ভূল বুঝতে পেরেছেন, যে তিনি এবং কেউই আইনের ঊর্ধে ছিলেন না বা কখনো থাকা উচিতও নয়। আমার কাছে সবসময়ই মনে হয়, প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ যে কত বড় মাপের নেতা ছিলেন তা বুঝতে আমদের জাতির হয়তো আরো কয়েকশ বছর লেগে যাবে। প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ'এর র্দূভাগ্য (আমদের জাতির সৌভাগ্য), তিনি সক্রেটিস, গ্যালেলিও'দের মত, তার সময়ের অনেক আগেই জন্ম নিয়েছেলেন। ৪১ বছর পর হলেও, কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, আজ বুঝতে পেরেছেন যে জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ' কত বড় মাপের একজন নেতা ছিলেন। তাই আজ কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম, এর মুখেও উচ্চারিত হয়, বাপের বেটা সোহেল তাজ! ধন্যবাদ, র্বতমান সরকার'কে, কাদের সিদ্দিকী'কে বুঝতে সাহায্য করার জন্য ।

সোহেল তাজ' এর পদত্যাগ নিয়ে একজন পাঠক জনাব আরিফ bdnews24 এ নীচের চিঠিটি লিখেছেন, যার মতামত ও যুক্তির সাথে আমি সর্ম্পূন একমত। চিঠির অংশ বিশেষ পাঠকের জন্য তুলে দেওয়া হল।

"প্রিয় সোহেল তাজ,

আপনি বলেছেন, 'সঙ্গত কারণেই' আপনি মন্ত্রীত্ব আর সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করে চলে গেলেন। এখানেই আপনাকে আমার বিনীত প্রশ্ন, 'সঙ্গত কারন' কতটুকু গেলে সঙ্গত হয়? কতটুকু হতাশা, কতটুকু অপমান, কতটুকু বেদনা বয়ে নিয়ে গেলে কারনটুকু 'সঙ্গত' হয়ে উঠে?

আপনার চিঠি পড়ে প্রথমেই মনে হলো-ভাগ্যিস আপনার বাবা 'সঙ্গত কারণ' খুঁজে বেড়াননি একাত্তরে। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে, প্রস্তুতিবিহীন অস্ত্রবিহীন এক অসম যুদ্ধ যখন তিনি পরিচালনা করছিলেন, তখন তাঁর আশেপাশেও খোন্দকার মোশতাকদের বিষ নিঃশ্বাস ছিল, তাঁর নিয়ন্ত্রনের বাইরেও একের পর এক বাহিনী গড়ে উঠছিল, নেতা গজিয়ে উঠছিল। কিন্তু তাজউদ্দীন স্বাধীনতার ধ্রুবতারার দিকে চোখ রেখে সাঁতার কেটেছেন সেই প্রতিকূল সমুদ্রে, 'সঙ্গত কারণ' জানিয়ে রণে ভঙ্গ দেননি। তাঁদের ত্যাগেই আজকের এই বাংলাদেশ।

আমাদের সমস্যা আজ এখানেই। আমরা সবাই পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু সেই পরিবর্তনটি জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় কেউ একজন করে দেবে বলে আশা করে বসে আছি। আমরা ঘরে বসে টেলিভিশনে টকশো দেখি, পত্রিকায় খবর পড়ি, সামাজিক যোগাযোগের সাইটে দীর্ঘশ্বাস ফেলি আর বলি-আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম। অথচ এই স্বপ্নকে সত্যি করার জন্য আমরা এবারের যাত্রায় কেউ একবারও মাঠে নামলাম না। যা-ও বা দুয়েকজন নামলেন, কিন্তু তাঁরা চেষ্টা করে গেলেন ভাসা ভাসা।

সুশীল মানুষেরা রাজনীতিকে সুশীল আর শুদ্ধ করার জন্য আফসোস করে যদিও রাজনীতির মাঠে খেলতে নামলেন, কিন্তু প্রথর্মাধ শেষ হওয়ার আগেই তাঁদের দম ফুরিয়ে গেল। বড় বড় ডক্টর সাহেবরা, যারা রাষ্ট্রের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, র্অথনীতির চালিকা শক্তির মতো ভারি ভারি শব্দ এক লহমায় উচ্চারণ করেন- তাঁরা ভাবলেন আমরা, নিরীহ জনতা তাঁদের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেব মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু তাঁরা জানেন না, বিজয়ের ট্রফিটা মাঠে নামার জন্য দেয়া হয় না, দেয়া হয় নব্বুই মিনিট খেলার পরে। তাঁরা শুধু মাঠে নামেন আর রাগ করে চলে যান। তারপর আমরা সবাই মিলে দূর থেকে বসে বসে সিস্টেমকে গালি দেই, রাজনীতিকে গালি দেই, সন্ত্রাসী আর মাস্তানিকে গালি দেই। আমরা বলি-রাজনীতি ভদ্রলোকদের জায়গা নয়।

অথচ পরিবর্তন এক র্দীঘ পথযাত্রা। নিব্বাচনী ইশতেহারে কালো কালো অক্ষরে মুদ্রিত হলেই এই পরিবর্তন সাধিত হয় না। প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতি ক্ষন-দন্ড-পলে তাঁকে একটু একটু করে সাধন করতে হয়। এই যাত্রাপথের ধৈর্য্য আমাদের প্রজন্মে আর কেউ দেখাতে পারলাম না, এই আফসোস রয়ে গেল মনে।

আমাদের আশেপাশের দেশগুলোতেই দেখুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাই না হয় হোক। দেখুন, ১৯৯১ সালে মাত্র ৩৬ বছর বয়েসে নিজে মন্ত্রী থেকেই নিজের দলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করছেন এই পুঁচকে যুবনেত্রী। তারপর? তারপর র্দীঘ পথযাত্রা। কংগ্রেসের বাইরে বেরিয়ে একা একা হেঁটে হেঁটে কুড়ি বছর পরে এই মমতাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। আমি মমতার রাজনীতি পছন্দ করি না, বাংলাদেশ নিয়ে তাঁর উন্নাসিক আচরণের নিন্দা জানাই, কিন্তু কথা সেটি নয় এখানে। আমি শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি যে র্দীঘ রাস্তা না হাঁটলে পরিবর্তনের কথা পত্রিকার পাতায়ই রয়ে যায়, জনগন সে কথায় বিশ্বাস করে না।

পাকিস্তানের মতো একটি ভাঙ্গাচোরা রাষ্ট্রে ইমরান খানের মতো একজন প্লেবয় ক্রিকেটার রাজনৈতিক দল করার পরে আজ পনের বছর ধরে লেগে থেকে এখন ক্ষমতার অংশ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করেছেন, কিন্তু আমাদের নোবেল লরিয়েট পনের সপ্তাহও

রাজনীতির মাঠে ধৈর্য্য ধরে ছিলেন না। এদেশের পরির্বতনহীন স্থবিরতার দায় তাই আমাদের প্রচলিত সিস্টেমের নয়, আমাদের কোনো কোনো নেতার অন্ধ দলবাজি আর র্মূখ স্বার্থান্ধতায় নয়; এই পরির্বতন না হওয়ার দায় আমার আর আপনারও"।

র্বতমান সরকারের ভবিষ্যতঃ যতই দিন যাচ্ছে, দেশের সাধারন মানুষের (যারা কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সরাসরি জড়িত নন বা সুবিধাভোগী নন) অবস্থা ততই শোচনীয় হয়ে উঠছে। আমারা যদি গত বিশ বছরের ইতিহাস দেখি, তাহলে দেখতে পাই, প্রতিবারের গনতান্ত্রিক সরকার, আগের বারের সরকারের চেয়ে অনেক বেশী র্দূনীতি গ্রস্থ এবং স্বেচ্ছাচারী ছিল। প্রতি তিন থেকে চার বছর পর পর, এই দুই দলের ক্ষমতা দখলের দ্বন্ধে জনগনের নাভিশ্বাস উঠে যায়। উন্নতির চাকা বার বার বন্ধ হয়ে যায়।

প্রক্ষান্তরে, আমরা আরো দেখতে পাই, একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ই (যখন এই দুই দলের কেউ ক্ষমতায় না থাকে), জনগন শান্তিতে থাকে, আইন শৃংখলা পরিস্থীতির যথেষ্ট উন্নতি হয়।

র্বতমান পরিস্থীতিতে প্রধান দুই দলই চাইবে, আমরা যদি ক্ষমতায় না থাকি তবে, প্রতিপক্ষ ক্ষমতায় আসার চেয়ে অন্য যে কেউ (তৃতীয় শক্তি) ক্ষমতায় আসুক! এই তৃতীয় শক্তি বা তৃতীয় পক্ষ, দেশের সবার প্রথম পছন্দ না হলেও, নিঃসন্দেহে সবার দ্বিতীয় পছন্দ। র্বতমান পরিস্থীতি, প্রতিদিনই তৃতীয় শক্তির আগমনের পথ কন্টকমুক্ত করে দিচ্ছে।

কে হতে পারে এই তৃতীয় শক্তি? আমাদের দেশে তৃতীয় শক্তি বলতে তৃতীয় কোন রাজনৈতিক দলের চেয়ে সেনাবাহিনী'কেই বুঝানো হয়। অনেকেই বলে থাকেন, র্বতমান বিশ্বের একমাত্র সুপার পাওয়ার আমেরিকা এই ধরনের ক্ষমতা গ্রহন অনুমোদন করবে না আর গত বারের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে সেনাবাহিনী (বিশেষত 'টপব্রাস') আর ক্ষমতা গ্রহনে আগ্রহী না।

যুক্তি দুইটি আসলে ঠিক নয়, কারন আমেরিকা তাদের স্বার্থ দেখভাল করার নিশ্চয়তা দিলে সেনবাহিনী কেন, সম্ভব হলে, পুলিশ এমনকি আনসারকেও ক্ষমতায় রাখতে দ্বিধা করবে না। নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য, প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে আমেরিকার অবস্থা অনেকটা, বাহির বলে দূরে থাক, ভিতর বলে আসুক না!

তাই আমরা দেখি, আমেরিকার চোখে বাহারাইনের সংখ্যালঘু নিষ্ঠুর শাসকরা ভাল মানুষ কারন তারা যে 'মার্কিনীদের বন্ধু' আর বাহারাইনের সংখ্যাগরিষ্ট মুক্তিকামী জনগন সন্ত্রাসী, কারন তারা যে শিয়া এবং ইরান পন্থী! র্বতমান সরকারের আয়ুস্কাল, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

হিলারি ক্লিনটনের একই সময়ে বাংলাদেশ সফর এবং তার ফলাফলের উপর অনেকাংশে র্নিভর করবে।

আমি মনে করি, এই মুহূর্তে সেনাবাহিনীর টপব্রাস'রা ক্ষমতা গ্রহনে আগ্রহী না হলেও, সেনাবাহিনীর মধ্যম সারির অফিসারদের মধ্য থেকে 'নাগিব-নাসের' ধরনের ক্ষমতা দখলের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পঞ্চাশের দশকে ইজিপ্টে নাসের এবং আনোয়ার সাদাত এর মত জুনিয়র অফিসাররা, জেনারেল নাগিব'কে সামনে রেখে রাজতন্ত্র উৎখাত করেছিলেন।

আগামীতে যদি বাংলাদশে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে, তবে তা ১/১১এর মত রক্তপাতহীন হবে না বলেই আমার ধারনা। বাংলাদেশে একই ধরনের ক্ষমতা গ্রহন হলে, দেশে এই বার বড় ধরনের রক্তপাত ও প্রচন্ড অরাজকতা সৃষ্টি হবে। আর আগামী দিনের ইতিহাস, সেই অরাজকতার জন্য সেনাবাহিনীর চেয়ে আমাদের প্রধান দুই দলকেই মূলত দায়ী করবে। যেমন লিবিয়া আর ইরাকের র্বতমান করুন অবস্থার জন্য, পশ্চিমা দেশগুলির লোভের চেয়ে গাদ্দাফী আর সাদ্দম এর স্বেচ্ছাচারী এবং নিষ্ঠুর একনায়কতন্ত্রকেই মানুষ মূলত দায়ী করে। গাদ্দাফী আর সাদ্দম'ই পশ্চিমা দেশগুলি আগ্রসনের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী করে রেখেছিল। গাদ্দাফী আর সাদ্দম'এর দেশ, দেশের তেল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মালায়েশিয়ার মত একটি সম্বৃদ্ধ ও স্থীতিশীল গনতান্ত্রিক দেশ হতে পারতো। শুধুমাত্র শাসকদের ক্ষমতায় থাকার লোভের কারনে একটি দেশ ও জাতির ভাগ্যে কতবড় দূর্যোগ নেমে আসতে পারে, তা দেখে আমাদের জাতির শিক্ষা নেওয়া উচিত।

আমার ব্যাক্তিগত ধারনা, আর কয়েক সপ্তাহ এই ধরনের অরজকতা চলতে থকলে, র্বতমান সরকারের মেয়াদ কোনভাবেই আর একবছরের চেয়ে বেশী নয়। আর আসন্ন সফরে হিলারি ক্লিনটনের (আমেকিরার) আশীব্বাদ না পেলে, সম্ভবত রমজানের চাঁদ দেখার আগেই, নতুন সরকার দেখার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান।

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনি ১ মে ২০১২ victory1971@gmail.com